১.৪ কাব্যনাট্য ও নাট্যকাব্যের পার্থক্য

কাব্যনাট্য ও নাট্যকাব্য এই দুটি সাহিত্য সংরূপের পরিচয় দিতে গিয়ে কোনো কোনো সমালোচক বেশ দিশেহারা হয়ে পড়েন। আমরা এই দুই শাখার তুলনামূলক আলোচনা করতে পারি।

প্রথমত : কাব্যনাট্য হল নাট্যপ্রধান নাট্য অর্থাৎ কবিতার আধারে রচিত হলেও এই শ্রেণির রচনা আসলে নাটক। আর নাট্য আধারে রচিত হলেও কাব্যময়তার আধিকে নাট্যকাব্য আসলে কাব্য।

দ্বিতীয়ত : কাব্যনাট্য নাট্যধর্মী রচনা - প্রধানত অভিনয়ের জন্য তা রচিত হয়। আর নাট্যকাব্য প্রকৃতপক্ষে গীতিকবিতার সমপর্যায়ভূক্ত। অভিনয়ের জন্য নয় - মুখ্যত পাঠ করার জন্য তা লেখা হয়। অর্থাৎ পাঠকের হৃদয় পিপাসা ও মননের খোরাক জোগায় নাট্যকাব্য।

তৃতীয়ত : কাব্যনাট্য হল 'Poetic Drama' তাই কাব্যের চরিত্রের সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে মিশলেও কবি নিজেকে এক নিরাসক্ত দর্শক করে রাখতে পারেন। আর নাট্যকাব্য হল objective form of poetry. তাই নিজের বক্তব্য চরিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করলেও কবি নিজেকে গোপন রাখতে পারেন।

চতুর্থত : কাব্যনাট্যে হৃদয়জাত আবেগ ও ভাব অনেকখানি নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে, কিন্তু নাট্যকাব্য কাব্যশ্রেণির অর্ন্তভুক্ত বলে এর কাব্যময়তা, অলংকরণ চাতুর্য, আবেগময়তা কাব্যনাট্যের তুলনায় কিছুটা বেশি হয়ে থাকে।

পঞ্চমত : কাব্যনাট্যের সংলাপ সাধারণত আকারে ছোট হয়ে থাকে। যথাযথ ও যুক্তিবদ্ধ হওয়ার সংলাপের দ্বারা নাট্য ঘটনার গতি ও দ্রুতির সমতা ঘটানো যায়, কিন্তু নাট্যকাব্যের সংলাপ দীর্ঘ হতে পারে - একটি ঘটনার রেশ অনুভূত হতে থাকে। কাব্যনাট্যে প্রয়োজন গদ্যসংলাপ ও সংগীত, আর নাট্যকাব্যে গদ্যসংলাপ ও সংগীত ব্যবহারের অবকাশ থাকে না।

ষষ্ঠত : কাব্যনাট্যে থাকে সংঘাত - অন্তঃসংঘাত ও বহিঃসংঘাতের যুগ্মপ্রকাশ ঘটে। সচরাচর নাট্যকাব্যে এই দুইয়ের সম্মিলন চোখে পড়ে না।

সপ্তমত : কোনো একটি বিশেষভাব বা অনুভূতি বা একটি সংকটজনক মুহূর্তকে ফুটিয়ে তোলার জন্য চমৎকার একটি পরিবেশ কাব্যনাট্য ও নাট্যকাব্য উভয়ক্ষেত্রেই সৃষ্টি করা হয়। উভয়ক্ষেত্রেই চরিত্রের বক্তব্য বেশ জোরালো ও আবেগমণ্ডিত হয়।

অষ্টমত : কাব্যনাট্যে নাট্য নির্দেশনা থাকে। কিন্তু নাট্যকাব্যে নাট্য নির্দেশনা ইত্যাদি অনুপস্থিত থাকে।

নবমত : কাব্যনাট্যে কাহিনি দীর্ঘ হওয়ার দরুণ চরিত্র সংখ্যা বেশি, আর নাট্যকাব্যে কাহিনি একমুখী হওয়ায় চরিত্রসংখ্যা কম।

দশমত : কাব্যনাট্য একটি পৃথক শিল্প মাধ্যম। কবিতাও নয়, নাটকও নয়। নাটকীয় কবিতায় ভাবাবেগের উত্তালতা অন্য নিরপেক্ষ। কিন্তু নাট্যকাব্যে একটি চরিত্রের ভাবাবেগ অন্য একটি চরিত্রের ভাবাবেগের সঙ্গে নির্মমভাবে সংলগ্ন প্রহার প্রত্যাশী।

কাব্যনাট্য এবং নাট্যকাব্য প্রকৃতিগতভাবে পৃথক ভেদরেখাটি বিতর্কিত বলেই বাংলায় এই দুটিকে পরস্পরের প্রতিশব্দরূপে ব্যবহারের প্রবণতা দৃষ্ট হয়। কাব্যগুণ নাট্যগুণকে অতিক্রম না করে যখন সমশক্তি সম্পন্ন সহযোগিতা বা আনুগত্য সম্পর্কে আবদ্ধ হয়, তাকেই কাব্যনাট্য বলা হয়। অর্থাৎ এক্ষেত্রে কাব্যের মন্ময়তা, আবেগ, কল্পনা, নাটকের দ্বন্দ্ব সংঘাত, ঘটনা-বৈচিত্র, চরিত্রায়ণ ইত্যাদির সঙ্গে চমৎকার একটি ভারসাম্য নির্ণয় করে। আর নাট্যকাব্যে কাব্যগুণের

প্রাধান্য বর্তমান এবং নাট্যগুণ কাব্যের বেষ্টনীর মধ্যে সংহত অর্থাৎ নাট্যত্ব এখানে কাব্যভাবনা, কল্পনার ভাবলোকের দ্বারা আচ্ছন্ন। নাট্যকাব্যে কাব্য থাকলেও নাটক তেমন দৃষ্টিগোচর হয় না। নাটকের গতি, ঘটনার বৈচিত্র্য সবই অন্তর্মুখী। আবেগ, অনুভূতি ও গীতিধর্মী সংলাপের প্রাবল্যে এর চরিত্র যেমন ভাবাশ্রয়ী, দ্বন্দ্ব বা সংঘাতহীন। তেমনি অবয়বের সর্বত্র অনুভূত হয় এক রহস্যময় ভাবুকতা যা মৃত্তিকা স্পর্শহীন ও কল্পলোক অভিসারী।

নাট্যধর্মের প্রভুত্ব কাব্যনাট্যে স্বীকৃত নয়। এমনকি চরিত্রের সংলাপও যে ছন্দোময় পদ্য হতে হবে তার কোনো নিয়ম নেই। কবিতার ছন্দ, আবেগ, অনুভূতির রমনীয়তা বড় জোর সংলাপকে আবেগ স্পন্দিত করতে পারে। তার বেশি কিছু নয়। এক্ষেত্রে নাটকীয় গতি, চরিত্রের সংঘাতময়তা ঘটনার বৈচিত্র, নাট্যশ্লেষ, উৎকণ্ঠা একই থাকতে পারে।

কাব্য আর নাটকের মেলবন্ধনে তৈরি রূপটি একদা কাব্যনাট্য নামেই অভিহিত ছিল। কিন্তু কিছুকালের মধ্যেই বোঝা গিয়েছিল ওই নামকরণটি যথাযথ হয়নি সম্ভবত। কারণ কাব্যধর্মীতা থাকা সত্ত্বেও দেখা যাচ্ছিল তার কোনোটিতে কাব্যগুণের মাত্রা বেশি, কোনোটিতে বা তীব্র হয়ে উঠেছে নাট্যধর্মীতা। ফলে নাট্যতাত্ত্বিকরা তখন এই সাহিত্য সংরূপটি ভেঙে কাব্যনাট্য (Poetic Drama) আর 'নাট্যকাব্য' (Verse Drama) নামে দুটি স্বতন্ত্র সংরূপ হিসাবে চিহ্নিত করলেন। পরবর্তীকালে আবার আধুনিক কাব্যনাট্যের চিত্র ও চরিত্র ধীরে ধীরে বদলে যেতে লাগলো। কবি আর নাট্যকারদের মধ্যে ভাব আর ভাষা নিয়ে চলতে লাগলো নানাবিধ পরীক্ষা নিরীক্ষা। এই সমুদ্রমন্থনে অবশ্য বহু ভালো মন্দর সঙ্গে গরলও উঠেছিল ঢের, তবে শেষ পর্যন্ত অমৃতকুম্ভও অধরা রইল না।

বিশেষকে নির্বিশেষ করে তোলার ক্ষেত্রে কাব্য ও নাটক সমসূত্রে এসে মিলে গেছে। আর এই গুণগত বৈশিষ্ট্যের কারণেই হয়তো প্রাচীন আলংকারিকেরা কাব্য ও নাটকের আঙ্গিকগত বৈশিষ্ট্যকে অবিচ্ছিন্ন রূপে দেখেছেন। উভয়ের শিল্পস্বভাবকে অভিন্নতার ঐক্যসূত্রে গেঁথেছেন। কাব্যের মধ্যে নাটককেই রম্য বলে সুনির্দিষ্ট করে রস ও প্রকারণগত স্বাতন্ত্রে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন। কাব্যের মধ্যে নাটককেই শ্রেষ্ঠত্ব দিতে তাঁরা প্রয়াসী - 'কাব্যেষু নাটকম রম্যম্'। স্নেহ, শোক, ভয় প্রভৃতি ভাব যখন মানুষের হৃদয়মন্দিরকে আচ্ছন্ন করে - তা ব্যক্ত করার প্রয়াস অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু ব্যক্ত হলেও প্রচ্ছন্ন অব্যক্তের গভীরতাও তার মধ্যে থেকে যায়। মানুষের বাইরের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া, আচার ও আচরণের মধ্য দিয়ে যা ব্যক্ত হয় - সেখানে নাট্যকারের অধিকার বিস্তৃত।

আর অব্যক্ত গভীর গোপনের মধ্যে কবির অধিকারের সাম্রাজ্য বিস্তৃত। প্রসঙ্গত ''গীতিকাব্য'' প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের বক্তব্য স্মরণযোগ্য - 'সত্য বটে যে গীতিকাব্য লেখককে বাক্যের দ্বারাই রসোদ্ভাবন করিতে হইবে, নাটককারেরও সেই বাক্য সহায়। কিন্তু যে বাক্য বক্তব্য নাটককার কেবল তাহাই বলাইতে পারেন। যাহা অবক্তব্য তাহাতে গীতিকাব্যের অধিকার।'[২৩] বঙ্কিচন্দ্রের এই অভিমত পর্যালোচনা করে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, নাটকের অন্যতম উপাদান কবিত্ব হলেও - শেষ পর্যন্ত কবিত্বই নাটকের পূর্ণতা এনে দিতে পারে না। মানব জীবনের কোন বিশেষ ঘটনার মধ্যে নিহিত থাকে নাট্যরস এবং নাটকীয় সৌন্দর্য। নাট্যকার সেই ঘটনার বাস্তব রূপকে নানা চরিত্র সৃজনের মাধ্যমে - নানান পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করেন।

কাব্য ও নাটকের গুণগত পার্থক্য বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে আমরা নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের ''নাট্যচিন্তা'' গ্রন্থের আলোকপাত করতে পারি - 'কবিত্বের রাজ্য সৌন্দর্য। নাটকের রাজ্য অনন্ত মানব চরিত্র। এখানে মানব চরিত্রে সুন্দর ও কুৎসিত এই দুই দিকই আছে। নাটকে মানুষের কুৎসিত দিকটাও দেখানোর প্রয়োজন হয়।[২৪] আর এই সুন্দরের গুণকে ফুটিয়ে তোলার জন্য এক শ্রেণির সাহিত্য সংরূপের পরিকল্পনা করা হয়েছে - আনুপাতিক বিচারে যার মধ্যে নাটকীয় গুণের চেয়ে কাব্যগুণের প্রাধান্য অধিক, এই শ্রেণির নাটককে 'নাট্যকাব্য' রূপে আমরা চিহ্নিত করতে পারি।